Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Gitabitan Sangeet Siskshmalay
Title: Paper cutting titled: *Brahammacharya Ashramer Dinguli*	Year of Publication: 1961
	Size: 24 c.m. x 18.5 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: O.K.
	Remarks: This article was published in Gitabitan, Rabindra Satabarshiki edition. Only few loose pages of the article have been preserved by the author with some notes.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দিনগুলি

30 th

annual

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার
বসু

1975

ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দিনগুলি

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

মাতৃহারা হয়েছিলাম দেড়বছর বয়সে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত দিদিমা ও বড়দির কোলেপিঠে মানুষ হয়েছি। তার পর এসে পড়লাম পিতৃ-ভবনের স্নেহবঞ্চিত কড়া শাসন-নির্যাতনের রাজত্বে। সেখানে বিনা-দোষে বা অল্প-দোষে গুরু দণ্ডলাভ ছিল দৈনন্দিন বরাদ্দ। মারের ভয় গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে শেখালো, 'দুষ্টু-ছেলে' বলে আমার খ্যাতি রটল চার দিকে।

দিদি, ভগ্নীপতি ও দিদিমার কাছে এই নির্যাতনের ইতিহাস অজ্ঞাত রইল না।

দিদিমা ও দিদির পুনঃ পুনঃ সকরুণ অনুরোধে বিচলিত হয়ে জামাইবাবু ক্রমাগত বাবার কাছে দরবার করে আমাকে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বাবার এক বন্ধু ও ভগ্নীপতির বিশেষ পরিচিত হিতকামী শশধর গাঙ্গুলি তখন ঠাকুর এস্টেটের অন্যতম সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তীর স্বর্গত পিতা ছিলেন বাবার গুরুভাই। সুতরাং শশধরবাবু ও অজিতবাবুর উদ্যোগে আমি অতি সহজেই সেখানে ভর্তি হবার সুযোগ পেলাম। সেটা ১৯১০ সালের কোনো মাস। বয়স তখন আমার বছর বারো।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় আগেই সংক্ষেপে দুটি কথায় আমার পরিচয় পেয়েছিলেন— আমি শৈশবে মাতৃহারা, আমি দুরন্ত। এই দুটি ন্যূনতার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, সেটা তখনকার কালের অনেক শিক্ষক ও সমাজহিতৈষীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতরাই বিখ্যাত বা কুখ্যাত রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও চিরাচরিত-প্রথাভঙ্গকারী হয়; নতুবা প্রবল রকমের বাস্তবমূল্য-পরিবোধশূন্য, ধ্যানধারণাপ্রবণ আদর্শবাদী বা মিষ্টিক হয়। বহুলোকের জীবনী থেকে এই নির্বচনকে প্রমাণিত করার মালমশলা পাওয়া যায়।

বোলপুর স্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছুবার জন্য আমার সহগামী আত্মীয়টি ছয় আনা কি সাত আনা ভাড়ায় একখানা গরুর গাড়ি ঠিক করে আমায় নিয়ে চড়ে বসলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলুম। শান্তিনিকেতনের এলাকায় ঢোকবার কিছু আগে থেকেই ভুবনডাঙ্গার অগণ্ডীর তালগাছ-ঘেরা বিস্তৃত দীঘি সন্ধ্যার অভ্র-আবীর মেখে দূর থেকে চিক্ চিক্ করছিল; তার পাড়ের অনতিদূরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাইয়ের উঁচু বাংলা দেখা যাচ্ছিল।

একদিকে আম্রকুঞ্জ, অন্যদিকে শালবীথি। তারি মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় অবিন্যস্ত ভাবে ছোটো-মাঝারি-লম্বা বারো-চৌদ্দখানি কুটির বা চালাঘর ও খানকয়েক একতলা কোঠাঘর। ওর একপাশে বেশ নীচু গোছের একটি নাতিবৃহৎ কোঠাবাড়ি। পরে জানা গেল, সেটার নীচের তলায় দু'খানা ঘরে লাইব্রেরি; একটা ঘরে বিধুশেখর শাস্ত্রীমশাই তাঁর বছর সাত-আটের একটি ছেলেকে নিয়ে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি সংস্কৃত ও

পালি পুস্তকপুঁথি পরিবৃত হয়ে বাস করেন। এর সংলগ্ন একটি একতলা দালানের নাতিদীর্ঘ কামরায় ছিল রাসায়নিক ও জড়-বিজ্ঞানিক পরীক্ষণাগার। এই ঘরের একপাশে ছিল একটি ছোটো দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

পাশে আর একখানা কোঠাঘরে জনকয়েক অল্পবয়সী ছাত্র থাকত। দোতলা লাইব্রেরি-বাড়ির ওপর তলায় উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্র বাস করত। ওইখানে সুধীরঞ্জনদা (বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যমহাশয়) তখন থাকতেন, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র।

ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘরগুলিতে কোনো কোনো শিক্ষক একাকী বা সপরিবারে থাকতেন। মাঝারি ও বড়ো চালাঘরগুলিতে ছাত্ররা থাকত; প্রত্যেক ঘরে একজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন। ঘরগুলির মেঝে কোনোটা একফুট, কোনোটা তার চেয়ে কিছু বেশি উঁচু, আগাগোড়া ইটবাঁধানো ও সিমেন্ট করা; দেওয়ালগুলি বেশির ভাগ এক ইটের গাঁথনি ও বালিচুন ধরানো। এই রকম একখানা মাঝারি লম্বা চালাঘরে একখানি তক্তাপোষে আমার স্থান নির্দিষ্ট হল। এই ঘরে ঐ সময় পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত থাকতেন।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক অজিতবাবুর কাছে আমাকে পেশ করে ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পরদিন দুপুরে চলে গেলেন। প্রথম দিনকয়েক খুব মুখচোরা ও সংকোচশীল ছিলুম; তার পর এক এক করে যখন সমবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ হল ও ভাব জমল, তখন মুখ বেশ বড়ো করেই খুলতে লাগলুম। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে, আমার মতো ও আমার চেয়ে বেশি দুষ্টু ছেলে এখানেও আছে। তাদের দুষ্টুমি নির্দোষ হলে কোনো সাজা দেওয়া হয় না। ক্ষতিকর কোনো দুষ্টুমির পরিচয় পেলে শিক্ষকরা মিষ্টি কথায় বোঝান-সোঝান, ক্বচিৎ তিরস্কার করেন। হাতে পায়ের ডাং-পিটেপনাকে তাঁরা কতকটা পরিমাণে প্রশ্রয় দেন— অবশ্য যদি না তাতে আশ্রমের কোনো আইন-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিরোধ(নি)ঘটে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিন্তু প্রথম প্রথম অন্ততঃ চার বিষয়ে আমি রীতিমত অসুবিধে বোধ করতে লাগলুম। কলকাতায় থাকতে পিত্রালয়ে যত লাঞ্ছনাই আমার সহ্য করতে হোক না কেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিনও দিদিমার স্নেহাঞ্চলবিচ্ছায়ে আরামে থাকতে পেতুম। তাঁকেই মা বলে জানতুম ও ডাকতুম, তাঁর আদরের স্নিগ্ধ হস্তাবলেপনে আমার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যেত। পাঁচ-ছয় দিন যেতে না যেতেই দিদিমা ও দিদির অভাব মর্মন্তুদভাবে অনুভব করেছিলাম এবং বোধ হয় দু'চার বার আমবাগানের এক নির্জন কোণে বসে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলাম। তাঁদের অভাবের তীব্র বেদনাবোধ অচিরে অনেকখানি তুলিয়ে দিলেন এক করুণার্দ্র চিত্তা মহিলা।

এই মহিলাটি ছিলেন অজিত চক্রবর্তীমশাইয়ের মহীয়সী জননী। উনি ছিলেন আশ্রমের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মেয়ে হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়িকা। ওঁর অধীনে তখন ১০।১২টি নানা বয়সী মেয়ে থাকত। এরা ছেলেদের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করত। সহাধ্যয়ন-প্রথা প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহোক, অজিত-জননীও আমার পিতার গুরুভগ্নী ছিলেন; তিনি আমার পিতাকে চিনতেন। আমার মাতৃহীনতাজনিত দুরবস্থার কথা তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখ থেকে বোধ হয় শুনেছিলেন। তাঁর ছোটো ছেলে সুশীল আমার সহপাঠী ছিল। সে একদিন তার মা'র কাছে আমায় ডেকে নিয়ে গেল; সম্ভবতঃ তিনি ওকে বলেছিলেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তাঁর ঘরে যাবামাত্র তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। বললেন: 'যখনি দিদিমা-দিদির জন্যে মন কেমন করবে, তখনি আমার কাছে চলে আসবে। আমার তিনটে ছেলে আছে, আজ থেকে চারটে হল।'

…তিনি আমাদের সংসারের সব তথ্য খুঁটিয়ে জেনে নিলেন এবং পিত্রালয়ে আমার দুঃখের কথা শুনে আঁচলে চোখ মুছলেন। তার পর হাণ্ট্‌লি পামারের টিনের কৌটো থেকে তিন চারখানি করে বিস্কুট আমার হাতে ও সুশীলের হাতে দিলেন, পরে খানিকটা পেয়ারার জেলি খেতে দিলেন। যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, ততদিন সপ্তাহে একবার কি দুবার করে আমার এই পাতানো মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর প্রাণভরা আদরাপ্যায়ন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। সুশীলকে তিনি দুষ্টু বলে মাঝে মাঝে তিরস্কার করলেও আমাকে লক্ষ্মী বলেই সম্ভাষণ করতেন।

আমার প্রথম অসুবিধার মেঘ অনেকটা কেটে গেল এইভাবে। দ্বিতীয় অসুবিধার কথা এইবার বলি। আমি আশৈশব রুগ্ন ছিলাম বলে দিদিমা আমায় খুব ভোরে কখনো উঠতে দিতেন না। শীতকালে সূর্যদেব দিক্‌চক্রবাল অতিক্রম না করলে— উঠানে রোদ্দুর এসে ছড়িয়ে না পড়লে, তিনি আমাকে কোনোমতে ঘরের বার হতে দিতেন না। পিত্রালয়ে এসেও গ্রীষ্মকালে ছটা ও শীতকালে সাতটা নাগাৎ উঠলে অভিভাবকরা বড়ো একটা বেত্রদণ্ড আস্ফালন করতেন না। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভোর ৪-৪৫ মিনিটের সময় মিনিট দুত্তিন ধরে পেটাঘড়িতে হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। তার আওয়াজ শুনলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণেরও কর্ণপটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম করে এবং তিনিও নিদ্রাবিসর্জন দিয়ে সক্রোধে হুঙ্কার ছাড়েন। শীতকালে অবশ্য শয্যাত্যাগের সময় পৌনে একঘণ্টা পেছিয়ে দেওয়া হত। প্রথম মাস খানেক এতে আমি রীতিমত বিরক্তি বোধ করতাম। তার পর আস্তে আস্তে এই কঠোর বিধি বরদাস্ত হয়ে গেল।

শীতগ্রীষ্মে যখনই শয়নভঙ্গ করতুম, তখনই বাইরে তারকাবিকীর্ণ অন্ধকার আকাশ দেখেছি— পূর্ব দিগন্তে উষার আভাসমাত্র দেখতে পেতুম না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের জলপাত্র হাতে করে আশ্রম-সীমান্তের বাইরে একটা ফলফসলহীন উষর উচ্চাবচ মাঠে ছুটতে হত। সেটা ছিল আশ্রমের পশ্চিম দিকে। এরই উত্তর একাংশে এখন উত্তরায়ণ অবস্থিত। সে মাঠের অনেকখানি এখন আশ্রম-এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেখানে এখন অনেক বাড়ি উঠেছে। বর্তমান মেয়েদের হোস্টেল, মীরাদি-র বাড়ি, 'প্রান্তনী' প্রভৃতি তখনকার সেই অশৌচ কলঙ্কব্রণ-গুলিকে মুছে দিয়েছে, তাদের স্মৃতির সম্ভাবনীয়তাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

ঐ সময় আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চারটিমাত্র মধ্যযুগীয় মেথর-খাটা খুপ্‌রি ছিল। অসুস্থ ও নিতান্ত অল্প-বয়স্ক ছাত্ররা ছাড়া অন্য কেউ এদের ভিতর প্রবেশাধিকার পেত না। তখন প্রাতঃকালে প্রাকৃতিক বেগবর্জনের আশ্রমিক পরিভাষাই ছিল 'মাঠে যাওয়া'। মাঠে যাওয়া ও দাঁত-মাজা মুখ-ধোওয়ার জন্যে আধ ঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া হত না। এরপর আর একপ্রস্থ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রশস্ত মাঠে হাজির হতে হত ব্যায়াম-চর্চা ও ড্রিলের নিমিত্ত। ঐ সময় কিছুদিন আমাদের ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেনহাটিনিবাসী হীরালাল সেন মহাশয়। 'হুঙ্কার' নামে একখানা জাতীয়তাভাবোদ্দীপক বই লিখে তিনি তদানীন্তন ইংরাজ শাসকদের বিষ-নজরে পড়েছিলেন। এই বই লেখার জন্যে তিনি বোধ হয় বছর দেড় কি দুই সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

হীরালালবাবু কারামুক্তির কিছুদিন পরেই শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রধানতঃ তিনি আমাদের ব্যায়াম ও ড্রিল শিক্ষা দিতেন এবং নীচের ক্লাসগুলিতে বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি পড়াতেন। রীতিমত সামরিক কায়দায় তিনি আমাদের ড্রিল করাতে শেখাতেন। তা ছাড়া লাঠি, ছোরা, ঢাল-তরোয়াল খেলা

গুলতি ছোরা প্রভৃতিও তিনি শিক্ষা দিতেন। সেনমহাশয় উৎকট রকমের ইংরাজবিদ্বেষী ছিলেন, তা তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে কথাবার্তায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। অথচ তিনি লাইব্রেরি থেকে প্রায়ই নানারকম ইংরিজি বই এনে নিবিষ্টচিত্তে পড়তেন। তাঁর শয্যার ওপর গীতা, চণ্ডী ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ' 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি বই ছড়ানো রয়েছে দেখতে পেতাম।

ভদ্রলোকের চেহারাখানি একান্ন বছর পরেও স্পষ্ট মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। উচ্চতায় ছ ফুট নিশ্চয়ই হবেন। রং অনেকটা পুরানো তামার মতো, কালো বলতে বাধো-বাধো ঠেকে। তাতে তেজ-সাহস-তীক্ষ্ণবুদ্ধির জৌলুস মাখানো ছিল। মহাভারতে ভীমের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু সেই বর্ণনার জীবন্ত প্রতিরূপ চর্মচক্ষে দেখার সুযোগ বোধ হয় হীরালালবাবু করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাহু-সম্মুখের সংকুচিত দ্বিশিরস্কা পেশীপিণ্ড লৌহ-গোলকের মতো শক্ত ছিল; আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বলবান ছাত্ররা তাতে সজোরে আঙুলের টিপ্ দিয়ে এক ফোঁটা টোল খাওয়াতে পারত না। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, স্কন্ধে তাঁর শুভ্রোজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত ছিল; নিষ্ঠার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক করতেন দেখতুম। গলার স্বর ছিল উদাত্ত গম্ভীর— অদূরাগত জলদমন্দ্রের মতো। তিনি দুচারখানা স্বদেশি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন আমাদের। শুনে সেই বয়সেই আমাদের প্রাণ নেচে উঠেছিল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

হীরালালবাবু কয়েক মাস পরেই আশ্রম ছাড়তে বাধ্য হলেন। তিনি ওখানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শুনেছি মাঝে মাঝে টিকটিকিরা এসে তাঁর খোঁজখবর করত, তাঁর কার্যকলাপের ওপর আড়াল থেকে নজর রাখত। উনি যুগান্তর পার্টির গোপন সন্ত্রাসমন্ত্রে দীক্ষিত হিংসাবাদী কর্মী, বৃটিশ রাজ-সরকারের কোপভাজন ব্যক্তি এবং শান্তিনিকেতন শান্তিময় পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার একান্ত অনুপযুক্ত—এই কথা কবিগুরুকে বারবার শুনিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ওরা। একদিন সকালে উঠে দেখি হীরালালবাবু তাঁর বাক্স-বিছানা নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।

যাক্, ব্যায়াম চর্চার সময় আমরা প্রভাতের প্রথম পদধ্বনিশ্রুতে পেতুম, পূর্বাচলে তার রক্তিমাভ আগমনী-চিহ্ন দেখতে পেতুম। এর পর ছিল স্নানের পালা। সেইটে ছিল আমার তৃতীয় অসুবিধা, বিশেষভাবে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে। আশ্রমের একটিমাত্র ইঁদারা থেকে বড়ো ছেলেরা টিনের ক্যানেস্তারা করে জল তুলে এক এক ক্যানেস্তারা ভর্তি হিমশীতল জল হাঁটু দুমড়ে বসা বেপথুমান ছোটোদের শিরে ঢেলে দিত। সত্যি, সেটা ছিল শীতল-সলিল-সংকুল একটা প্রাত্যহিক অগ্নিপরীক্ষা। নিরুপায় হয়ে সেটাও সয়ে নিতে হল।

স্নানের পর আর একবার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কম্বলের আসন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হত মাঠে-বাগানে বিজন উপাসনা করতে। অনেক সময় আমরা কেউ কেউ চারহাত পাঁচহাত অন্তর বসে চোখ বুজে থাকতুম। কেউ কেউ চোখ মেলে চুপচাপ বসে থাকত, কেউ কেউ বিড়্ বিড়্ করে হয়তো কোনো কিছু কবিতা বা শ্লোক আওড়াতো, কেউ কেউ খড়কুটো ধুলো নিয়ে খেলা করত; যাদের পৈতে হয়ে গিয়েছিল তারা গায়ত্রী জপ করত।

কখনো কখনো কোনো দুষ্টু ছেলে অদূরবর্তী কোনো সমবয়সী বা বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলের গায়ে একটি ছোট্টো মাটির ডালা ছুঁড়ে মেরে পরম ভক্তিভরে সজোরে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলত। রূপে বা অরূপে আমি কোনো দেবতা

বা ঈশ্বরের উপাসনা যতবারই করতে গিয়েছি ততবারই দিদি, মেজদিদি, দিদিমা বা বহুদিন পরলোকপ্রাপ্ত বুড়ো দাদার চেহারাখানা নির্মীলিত চোখের কালো পর্দায় আপনা আপনি ভেসে উঠতে দেখেছি। এইভাবে সেই বয়সে 'প্রিয়রে দেবতা' জ্ঞান করতে শিখেছিলুম।

উপাসনা বোধ হয় মিনিট দশেক চলার প্রথা ছিল। তার পর আশ্রমের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্র শালবীথির দক্ষিণের মাঠে একত্র ও পূর্বাস্য হয়ে সমবেত প্রার্থনা করতেন। এক বৈদিক মন্ত্র ছিল এই প্রার্থনার উপজীব্য— 'ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তে স্তু। মা মা হিংসী। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'···ইত্যাদি।

সমবেত প্রার্থনা সমাপনান্তে আমরা সবাই হুড়োহুড়ি করে রান্নাবাড়ির হাতায় গিয়ে হাজির হতুম জল-খাবারের লোভনীয় উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে। কোনোদিন মোহনভোগ, কোনোদিন রুটি আলু-চচ্চড়ি, কোনোদিন বুঁদে, কোনোদিন গজা, কোনোদিন মিহিদানা। আশ্রমে চায়ের পর্ব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। বেশ মনে আছে চৌদ্দ বছর বয়সের সময় প্রবল সর্দিতে দুদিন আদামিশ্রিত চা পান করেছিলুম— জীবনে সেই প্রথম!

জলখাবার খেয়ে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ছুটত তার বই-খাতা পেন্সিল আর কম্বলাসন নিয়ে নির্দিষ্ট গাছতলাটিতে ক্লাস করার জন্যে। তখন নিয়ম ছিল যে ছেলে বা মেয়ে যে বিষয়ে যে ক্লাসের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত, সে সেই বিষয়ে সেই ক্লাসে পড়বে। আমি প্রথমে গিয়ে ফিফ্‌থ্ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলুম। কিন্তু অঙ্কে বেজায় কাঁচা বলে আমাকে দিন কয়েক পরে সিক্সথ্ ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হল। মাসখানেক পরে একটা পরীক্ষার ফল দেখে আমাকে ইংরাজি বিষয়টি ফোর্থ ক্লাসে পড়বার অনুজ্ঞা দেওয়া হল। এইভাবে মেধানুযায়ী ক্লাসের ইতরবিশেষ করার বিধি কিছুকাল পরে তুলে দেওয়া হয়।

ঋতু অনুযায়ী সকালের দিকে তিন ঘণ্টা থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা ক্লাস চলত। তার পর ছুটি হয়ে গেলে আমরা কলরব করতে করতে নিজের নিজের ঘরে ও সীটে ফিরতুম। খাতা বই গুছিয়ে রাখতে না রাখতেই মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ঘণ্টা পড়ত। ঋতু হিসেবে এই ঘণ্টা বাজার সময়ে তারতম্য ঘটত। মোট কথা এগারটা থেকে বারোটার মধ্যে আমাদের আহার সমাধা হত।

এইখানেই চতুর্থ অসুবিধার প্রসঙ্গ আসছে। খাওয়াটা ছিল নিছক ও নিতান্ত নিরামিষ রকমের। মাছ-মাংস-ডিমের প্রবেশ নিষেধ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। মাছের বিরহে বেশ কিছুদিন গোপনে ছটফট করেছি। নিরামিষ আহারের পদগুলি সংখ্যায় অতিসংক্ষিপ্ত, অত্যন্ত মামুলি ধরণের এবং তাতে বৈচিত্র্য-সাধনের উদারতা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হত। ঋতুজাত একাধিক তরকারির একটা ঘণ্ট বা চচ্চড়ি, অড়হর কাঁচামুগ বা মুসুরির ডাল ও আলু বা আলু পটোলের ফটিক-ঝোল; ক্বচিৎ ভাজা, ক্বচিৎ অম্বল বা চাটনি। রাত্রিতে ছটাক তিনেক করে দুধ প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল, কিন্তু অম্বল থাকত না। দুধ আমার প্রিয় খাদ্য ছিল বটে, কিন্তু তবু নিরামিষ রুচিনিষ্ঠ হতে আমাকে বহুদিন ধরে মনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে হয়েছে। ছ মাসের মধ্যেও আমিষের প্রলোভন জয় করতে পারি নি এবং তার প্রলোভনে পড়ে কি দুষ্ক্রিয়া করেছিলুম তা পরে বলছি।

দুপুর বেলা আমাদের কারুর ঘুমোবার জো ছিল না, নিয়মও ছিল না। এই সময় প্রত্যেককে পড়া মুখস্থ করতে ও লেখার কাজ করতে হত। শীতকালে বিছানা পত্র রোদ্দুরে দিতে হত, স্নানের পর মেলে-দেওয়া কাপড় তুলে কুঁচিয়ে ও গুছিয়ে রাখতে হত। প্রত্যেক ঘরে প্রতিমাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রদের ভিতর থেকে ভোটের দ্বারা একজন মনিটর নিযুক্ত হত। তার নির্দেশে এক একজনকে এক এক বেলা ঘরদ্বারবারান্দা ঝাঁট দিতে ও কুঁজোয় জল ভরে রাখতে হত।

প্রায় প্রতি ঘরের সামনে পিছনে সুবিধামত খালি জায়গায় ছেলেরা ফুলের ও সব্জীর চাষ করত। মূলো কপি শিম বরবটি বেগুন প্রভৃতি আমরা ছোটো ছোটো জমিখণ্ডে ফলাতুম। তা ছাড়া নানারকম দেশি বিলাতী ফুলের কার-কিংও করতুম। কবিগুরু মাঝে মাঝে এইসব শিশুবাগিচায় বেড়িয়ে আমোদ পেতেন এবং সক্রিয় উৎসাহী ছাত্রদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

আশ্রমে আর একটা কঠোর নিয়ম ছিল কেউ কোনো রকমের জুতো ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা সবাই বাড়ি-থেকে-পরে-আসা জুতো জোড়া কাগজে জড়িয়ে রেখে দিতুম, দীর্ঘ অবকাশ প্রাক্কালে বাড়ি ফেরবার সময় আশ্রম-এলাকার বাইরে গিয়ে পায়ের লাল বেলে মাটি ঝেড়ে ঝুড়ে পুনরায় জুতো পরতুম। খালি পায়ে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে কাঁকুরের মাটির ওপর দিয়ে চলাফেরা বা দৌড়োদৌড়ি করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ছিল। শিক্ষকদের কেউ কেউ ক্যাম্বিসের জুতো কেউ কেউ খড়ম ব্যবহার করতেন; দু'একজনকে বোধহয় মখমলের চটিও পরতে দেখেছি। কবিগুরু জরির পাড় দেওয়া সাদা রংয়ের শুঁড়তোলা চটি পরতেন মনে পড়ে; তা কিড লেদারের ছিল কিনা জানি না।

একবার মুর্শিদাবাদ কিংবা বীরভূমের এক জমিদারের ছেলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস করতে এল একজন গৃহশিক্ষক একজন গৃহভৃত্য, চারটি বড়ো বড়ো স্টীলট্রাঙ্ক, একটি ফল ও খাবার-ঠাসা বেতের বাক্স, একটি হরিণের চামড়ামোড়া হাতলওয়ালা চেয়ার এবং প্রকাণ্ড এক শয্যাশৈল পরিবৃত হয়ে। আমার চেয়ে বয়সে সে বছর দুইয়েকের বড়ো হবে। বেশ নাদুস-নুদুস পোলাও-কালিয়া-ঘি-দুধ-খাওয়া চেহারা, এবং সিঁদুরে মেঘের মতো, দাঁতগুলো দাড়িম বীজের মতো, কিন্তু চোখ দুটি ঈষৎ কটা ও ছোটো, চুলগুলিও গাঢ় রকমের কটা ছিল।

একটা ছোটো কোঠাঘরে ওটি পাঁচ-সাত ছেলের মধ্যে তার সিট নির্দিষ্ট হল। অন্য কারো সঙ্গে সে থাকতে নারাজ, তার পৃথক ঘর চাই বলে বায়না শুরু করল। সে বায়না মেটার আশা নেই দেখে, সে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। তার পর যখন সেই ঘরের তত্ত্বাবধায়ক মাস্টারমশাই তাকে জুতো ছাড়তে ও মাথায় সযত্নে কাটা অ্যালবার্ট টেড়ি ভেঙে ফেলতে বললেন, তখন সে প্রথমটা থাপ্পা হয়ে মাস্টারমশাইকে দু চারটে শক্ত কথা শোনাল। তার পর সঙ্গে আগত গৃহশিক্ষক মহাশয় তাকে মৃদু ধমক দেওয়ায় সে চুপ করে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এখানে খালি পায়ে রুক্ষ মাথায় নিরামিষ খেয়ে একদিনও থাকতে পারব না। এ ব্রহ্মচর্যাশ্রম না কয়েদখানা? বাবা কি আমায় মুনি ঋষি করবার ষড়যন্ত্র করেছে?'

আমি তখন পাশের একটা ঘরে থাকি। পরদিনই তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। প্রায় সব বিষয়েই সে আমার ক্লাসে ভর্তি হল। ক্লাস ভাঙার পর সে আমাকে বললে, 'তোমরা এত কষ্ট সয়ে কি করে থাক ভাই?

আমি ভাই আজই ঠাকুমাকে বেশ কড়া করে একটা চিঠি লিখছি। তারপর রোজ একখানা টেলিগ্রাম ঝাড়ব বাবাকে। রোসো, একবার ফিরে যাই দেশে, তার পর বাবারই একদিন কি আমারই একদিন।'... ছেলেটি কোনোমতে চোখকান বুঁজে বোধ হয় দিন আষ্টেক আশ্রমে ছিল। তার পর জমিদারির ম্যানেজার এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সে যে কয়দিন ছিল, সেই কয়দিন আমার পাঁচ ছ'টি সহানুভূতিশীল বন্ধুকে সমস্ত পাত্রগুলি খালি করে বিস্কুট, লজেঞ্জস্, মার্মালেড, জেলি, মোটা আমসত্ত, গোলাপী ও আনারসের সরবৎ প্রভৃতি আশ মিটিয়ে খাইয়েছিল। তা ছাড়া সে তিন শিশি এসেন্স, এক শিশি গন্ধ তৈল ও এক শিশি লোশন সঙ্গে এনেছিল, তার প্রায় সমস্তটাই আমাদের গায়ে কাপড় জামায় ও মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তার বিতরিত গন্ধসারের সুবাস তার ঘরের বাতাসে ও আমাদের পরিচ্ছদে অনুলিপ্ত ছিল। জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

ঋতুবিশেষে আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে আবার আমাদের বৈকালিক ক্লাস শুরু হত। ঘণ্টা দুই ক্লাস চলার পর ছুটি হয়ে যেত। জলখাবার খেয়ে আমরা খেলতে মাঠে ছুটতুম। ফুটবল, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি উন্মুক্ত ক্ষেত্রের খেলা। কবিগুরু এক-একদিন এসে আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন; ছোটো ছোটো ছেলেদের দৌড়ের বাজিতে আহ্বান করতেন।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে খেলা ভঙ্গ করে সকলে যে-যার সীটে বসে আর একবারের জন্যে অল্পক্ষণ ধরে উপাসনা করত, তার পর শিক্ষকদের ঘিরে গল্প-গাছা ও গানের আসর বসত। ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কাউকে রাত্রিকালে পড়তে দেওয়া হত না। শিক্ষকমশাইরা বড়ো বড়ো হলঘরের মাঝখানে বসে ছোটো ছেলেদের নানা দেশের প্রবাদ-ছড়া-রূপকথা-ভ্রমণকাহিনী শোনাতেন; মধ্যবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের স্বদেশি বিদেশি নানা বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের সার সংগ্রহ করে মনোরম ভাষায় কথকতার মতো বর্ণনা করে যেতেন।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানশিক্ষক জগদানন্দ রায়-মশাই বোধ হয় পনেরো ষোলোদিন ধরে Ivanhoe উপন্যাসের আখ্যান-ভাগ সরস রূপকথার মতো করে কিস্তিতে কিস্তিতে আমাদের শুনিয়েছিলেন। তার পর তিনি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনী, গ্রহনক্ষত্রপৃথিবীর জন্মকথা সরস কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত করতেন।

যতদূর মনে পড়ে, তিনিই ধারাবাহিকভাবে David Copperfield, Oliver Twist, Rob Roy, Kenilworth, Vicar of Wakefield প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের উপন্যাসগুলি গল্প করে আমাদের অবকাশ-বিনোদন করেছিলেন। কোন্ মাস্টারমশাই মনে নেই— Pilgrim's Progress-এর গল্প ঐভাবে কিস্তিবন্দী হারে শুনিয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু ও বঙ্কিমবাবু টডের রাজস্থান থেকে ও কার্লাইলের History of the French Revolution থেকে গল্প বলে শুধু আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন নি, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

রাত্রি আটটার সময় ছ বছর বয়েস থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেরা খেয়ে নিত; তার পর আমাদের ডাক পড়ত সাড়ে আটটা নাগাৎ। ন টার মধ্যে শিক্ষক-ছাত্র সকলের খাওয়া খতম হয়ে যেত। সাড়ে ন টার মধ্যে উপরের দুটি ক্লাসের ছেলেরা ছাড়া বাকি সকলকে শয্যাগ্রহণ করতে হত।... এই ছিল আমদের নিত্যকৃত্যের নির্ঘণ্ট।

সাধারণত আমাদের ইংরিজি বিষয়ের ক্লাস নিতেন জ্ঞানবাবু। আমার ওখানে যোগ দেবার পাঁচ-ছ দিন পরে জ্ঞানবাবু কলকাতায় চোখের অসুখের চিকিৎসা করাতে চলে যাওয়ায় বিশ্বকবি নিজে এলেন আমাদের ইংরিজি

পড়াতে। তখন আমাদের পাঠ্য ছিল ম্যাকমিলান কোম্পানির সায়েন্স রীডারের একটি খণ্ড, যেখানিকে আজ পর্যন্ত আমি সংরক্ষণ করে এসেছি। চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখার একটি গল্প তিনি পড়ালেন। পড়ানো আর গল্প শোনানোর মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা সেদিন চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রত্যেক শব্দের যে একটি রূপ বা মূর্তি আছে, তার ধ্বনির পেছন থেকে যে একটি অর্থ বাহু বিস্তার করে প্রকাশের পথে আপনি বেরিয়ে আসে, তা তিনি প্রথম অনিয়ে দিলেন সেদিন।

তার পর বোধ হয় দুই ক্লাসে পনেরো ষোলোবার তাঁর কাছে ইংরিজি পড়বার সুযোগ হয়েছে আমার। অর্থ ও ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরগ্রামে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করার শৈলীটি তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এলোকিউশন ও অভিনয়ের অনন্যসাধারণ পারগামিতা দেখে আমরা সেই অপরিণত বয়সেই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি; আজ স্মৃতিপটে তার প্রতিফলন দেখে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ি। Indefatigable শব্দটি প্রসঙ্গক্রমে তিনিই শিখিয়েছিলেন, তা আজও মনে রেখেছি। অল্প বয়েসে বি.এ. এম.এ.-র ছাত্রছাত্রীদের এই শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করে অনর্থ ঘটিয়েছি।

ঐ সময় আমাদের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন হরিচরণবাবু। তখন থেকেই তিনি কবিগুরুর উৎসাহ ও আশীর্বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে শব্দকোষ প্রণয়নের ভিত্তি নির্মাণ শুরু করেছিলেন। বাংলা পড়াতেন প্রভাতবাবু ও কালীমোহনবাবু। ইতিহাস শরৎবাবু। ভূগোল বঙ্কিমবাবু ও নেপালবাবু। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে গুরুদেব এক একদিন আমাদের সংস্কৃত ও বাংলা ক্লাস নিতেন। তাঁর কিন্নরনিন্দিত সুমিষ্ট গলায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি যখন উচ্চারিত হত, তখন মনে হ'ত তারা প্রাণস্ফুলিঙ্গ পেয়ে যেন আনন্দে নৃত্য করছে। তাঁর কাছে আমরা কথা ও কাহিনীর কোনো কোনো কবিতার পাঠ নিয়েছি। তিনি 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'নরকবাসের' কতকাংশ পড়িয়েছেন। বোধ হয় 'গান্ধারীর আবেদন' সমস্তটাই আমাদের টীকাটিপ্পনী দিয়ে পাঁচ ছ দিন ধরে পড়িয়ে বুঝিয়েছিলেন। আম্রকুঞ্জে তিনি ক্লাস নিতেন। শেষোক্ত কাব্যনাটিকাটি আমরা কাপড় টানিয়ে অভিনয় করেছিলাম। কবিগুরু নিজে দুপুরবেলা কদিন ধরে আমাদের কজন অভিনেতাকে আবৃত্তি ও অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে প্রবোধ বলে একটি ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, প্রদ্যোৎ (সেনগুপ্ত) গান্ধারী ও আমি দুর্যোধনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলুম।

কবি তখন 'দেহলী' নামক পুরনো দোতলা গৃহের উপরের তলায় বাস করতেন। উদয়ন-উদীচী-শ্যামলী পুনশ্চরা তখন রাজমিস্ত্রীদের কর্ণিকের স্পর্শ থেকে বহুদূরে কল্পলোকেরও ঊর্ধ্বে ছিল। 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' থেকেও আমরা দুখানি নাটিকা অভিনয় করেছিলাম। প্রত্যেকটাতেই আমি একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। রোজ দুপুরবেলা একটা দেড়টার সময় কবিগুরুর ফরাসপাতা বড়ো ঘরখানাতে আমরা সসংকোচে গিয়ে হাজির হতুম এবং মহলা দেবার সময় তাঁর সুখশ্রাব্য বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতুম।

দুপুরবেলা কখনো তাঁকে নিদ্রাগত হতে দেখি নি; আজীবন তিনি সংযতনিদ্র ছিলেন। রাত্রিতে তিনি শুতেন বারোটার সময় এবং শয্যাত্যাগ করতেন চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। সারাদিন তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সহস্র কাজের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। জগতের শ্রুতকীর্তি শ্রেষ্ঠ পত্রলেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুনেচি নেপোলিয়ন তাঁর স্বল্পায়ু ক্ষমতাকালের মধ্যে ছোটো বড়ো প্রায় চল্লিশ হাজার চিঠি সন্ধিপত্র ও দলিলদস্তাবেজ কর্মচারীদের দ্বারা লিখিয়েছেন নিজে সংশোধন ও সই করে গেছেন। আমার ধারণা, কবির আকৈশোর স্বহস্তলিখিত পত্রসংখ্যা চল্লিশ হাজারের কম হবে না। দুপুর

সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে স্বহস্তে হোক বা পরহস্তে হোক পত্র লেখার [illegible] ও মিসেস [illegible] রুজভেল্ট কবিগুরুর [illegible] পেতে পারেন।

বেলার বেশির ভাগই তিনি পত্র লেখায় ব্যয় করতেন। নতুবা পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন। কোনো কোনোদিন তাঁকে নিজের হাতে কাপড় কোঁচাতে ও জামা পাট করে নিপুণ হস্তে ইস্ত্রি করতে দেখেছি। চাকরবাকরদের অনেক কাজই তাঁর মনোমতো হত না বলে তিনি সেগুলো নিজে করে তৃপ্তিবোধ করতেন।

আশ্রমে আসার তিন চার দিন বাদে একটা ছুটির দিন সকাল নটা নাগাৎ অজিতবাবু আমায় সঙ্গে করে কবির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবি তখন দেহলীর দক্ষিণের গাড়িবারান্দার ওপর একখানা ইজিচেয়ারে প্রায় পূর্বাস্য হয়ে বসে আছেন। সামনে একটা ছোটো টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গান কিংবা কবিতা লিখছেন। শিরীষ ও আমলকি গাছের পত্রচ্ছদের ছাঁকনি দিয়ে হিমেল প্রভাতের অংশুল আভা বেরিয়ে এসে তাঁর মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। তার মাথার চুল ও গোঁফদাড়ির অর্ধেক ভাগ কাঁচা ছিল তখন, কিন্তু পরিস্রুত সূর্যালোকে তার আগাগোড়াই রুপোলী দেখাচ্ছিল; সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন একটা অস্পষ্ট ভঙ্গিল পেলব দ্যুতির বাহুরেখা জড়ানো রয়েছে দেখলুম।

অজিতবাবু কবির দৃষ্টিপথে পড়ামাত্র আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন কবির দিকে। আমি সলজ্জ শঙ্কায় প্রণাম করে একটু পেছিয়ে দাঁড়াতেই অজিতবাবু বললেন: 'এই ছেলেটির কথাই শশধরবাবু আপনাকে লিখেছিলেন। আমার বাবামায়ের গুরুভাই কলকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকপ্রকাশক এস্. সি. বোসের ছেলে— কদিন আগে আশ্রমে এসেছে।' কবি বললেন: 'হাঁ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যশিষ্যা ওঁরা তা জানি। শশধরবাবু এর কথা লিখেছিলেন বটে।'

সোনার ফ্রেমে আটা পাঁস্‌নে জোড়া নাকে লাগিয়ে আমার দিকে অতল স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন; তার পর সুধালেন: 'কত বছর বয়সে মা হারিয়েছ?' উত্তর শুনে বললেন: 'বিমাতা আছেন বুঝি? ওহে অজিত, তোমার মাকে বোলো মাঝে মাঝে এই ছেলেটির একটু খোঁজ খবর নিতে।'

স্বপ্নসুষমামাখা আয়ত চোখ দুটি তাঁর অশ্রুজলে ছল ছল করে উঠল। অল্প বয়সে মা হারানোর ব্যথা তিনি মর্মে মর্মে জানতেন; তাঁর ছেলে মেয়েরাও কিছু জানত।

একটু-আধটু গান গাইতে পারি শুনে বললেন: 'সন্ধের পর আমি কিংবা দিনু যখন ছেলেমেয়েদের গান শেখাই, তখন মাঝে মাঝে গল্পের আসর ছেড়ে এসে দু একখানা করে গান তুলে নিও গলায়।' ··· সংগীতভবন, কলাভবন প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নি তখনো। হারমোনিয়ম্, সেতার প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন রাগরাগিণীর অনুক্রমে সা-রে--গা-ম্ সেধে গলা তৈরি করার ঐতিহ্যগত প্রথা ছাত্রছাত্রীরা মেনে চলত না তখন। তবে মেয়েদের হোস্টেলে দুই তিনজন ছাত্রী সেতার ও এস্রাজ নিয়ে কসরৎ করত শুনেছি।

নৃত্য আমরা সাঁওতাল ও বাউরিদের কিংবা পৌষমেলায় কবি ঝুমুর দলের আসরে অসম্পৃক্ত কৌতূহলে দর্শন করেছি; কিন্তু আশ্রম বালকবালিকাদের পায়ে কখনো সে তারা ছন্দ-হিল্লোল জাগায় নি। জাগিয়েছিল প্রায় দশ বছর পরে বিশ্বভারতীর ক্ষুধিত অন্তর্দেবতা। পাঠ-ভবনের প্রশস্ত প্রোজ্জ্বল সৌধগরিমা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কণ্ঠরোধ করেছিল তখন।

স্বভাবগতভাবে যাদের সুরজ্ঞান, মিষ্টস্বর, মোটামুটি তাল ও মাত্রাজ্ঞান ছিল, তাদেরই কবিগুরু ও তাঁর সুরধর পৌত্র তাঁদের মামুলি অর্গ্যানের চার পাশে টেনে এনে, ঐকালে লেখা প্রায় সমস্ত গানই টাটকা-টাটকা গলায় বসিয়ে দিতেন। একমাত্র ক্লাসে ও খাওয়ার সময় ছাড়া আর কোথাও গুঞ্জন করে বা গলা ছেড়ে আপন মনে বা পাঁচজনে মিলে গান গাওয়ার কোনো মানা ছিল না, বাধা ছিল না। আমরা তখন অনেকেই সুরের সুরধুনীতে শিশু-সুলভ চপল উল্লাসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীরের ধার ঘেঁষে সাঁতার খেলেছি। অনেকেই আমরা গানের ওস্তাদ হই নি বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সুরজ্ঞ ও সুররসিক হয়েছি, গান দিয়ে নিজের বিচ্ছেদ-বঞ্চনা-ব্যর্থতা-বেদনার তীক্ষ্ণতাকে খর্ব করতে পেরেছি— ভুবনের গায়ে হাত বুলিয়ে সুখে বেড়াতে পেরেছি।

আমার অবস্থানের সময় গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ গানগুলি কবি লিখছেন ও তাতে সুর সংযোজন করছেন। শান্তিনিকেতনে বসে যে গানগুলি তিনি লিখতেন, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম দিনুবাবুকে ও তার পর একদল বাছা (দশ বারো জনের বেশি নয়) ছাত্রছাত্রীর গলায় তুলে দিতেন। দিনুবাবু কবির প্রত্যেক গানের নোটেশন রাখতেন। মাঝে মাঝে কবির ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ও ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানী বেড়াতে এসে কবির নিকট থেকে নয় দিনুবাবুর নিকট থেকে মধ্যবর্তী সময়ে লেখা কবির অধিকাংশ গানের সুর তুলে নিয়ে যেতেন। কবি ও দিনুবাবুর কাছ থেকে শেখা অন্ততঃ খান যাটেক গানের মধ্য থেকে যেগুলোর সুর আজো মোটামুটি মনে রেখেছি এবং সভায়-মজলিসে-তারে-বেতারে যাদের নির্যাতনজনিত আর্তনাদ প্রায়ই শুনতে পাই, সেগুলো থেকে কয়েকটির উল্লেখ এখানে বোধ হয় অশোভন হবে না। যেমন, 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে,' 'তুমি কেমন করে গান কর', 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,' 'এসো হে এস সজল ঘন,' 'পারবি না কি যোগ দিতে,' 'শরতে আজ কোন অতিথি,' 'গায়ে আমার পুলক লাগে,' 'আসনতলের মাটির পরে,' 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন', 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে,' 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,' 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা,' 'এই করেছ ভালো নিঠুর,' 'যাবার দিনে এই কথাটি,' 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' ··· ইত্যাদি।

কবির প্রৌঢ় বয়সের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একবার প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায়, আর একবার কিসে কোন ভূমিকায় মনে করতে পাচ্ছি না। গেরুয়া আল্‌খাল্লা-পরা মাথায় পাগড়ি-জড়ানো শালশিশুর মতো তাঁর সুদীর্ঘ দেহ এখনো স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'ওরে আগুন আমার ভাই আমি তোমারি জয় গাই' 'বল ভাই ধন্য হরি,'— 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' এই তিনখানা গানে কবি মনোহরণ ভাবচঞ্চল তাণ্ডব দেখিয়ে দর্শক প্রাণে পুলক শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অপ্সরলাঞ্ছিত কণ্ঠে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' এখনো হৃৎকন্দরে প্রতিধ্বনি তোলে। কোথাও রাঙা মাটির পথ দেখলে তার দূরতম প্রান্তসীমায় ধনঞ্জয়রূপী কবিগুরুর ছায়ামূর্তি যেন দেখতে পাই। প্রায়শ্চিত্তে জামাতা রামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জগদানন্দবাবু ও বিভার চরিত্রে অবতরণ করেছিলেন শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

আমি তখন নাট্যঘরের এক-ফুট-উঁচু-করে-গাঁথা পাকা মঞ্চের ওপর একটা সীটে থাকি। আমার পাশেই পরবর্তী কালের প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী মুকুল দে থাকত। বয়সে কিছু বড়ো হলেও ও প্রায় সকল বিষয়েই আমার সহপাঠিত্ব করত। তখন থেকেই ও ছবি আঁকায় মন দিয়ে পড়াশুনোয় অবহেলা করত বলে কবিগুরু ও ক্ষিতিমোহনবাবু ওকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করতেন। নাট্যঘরে যে রাত্রিতে অভিনয় হত, সেদিন বিকাল বেলায়ই

অধিবাসী ছাত্রদের তক্তাপোষগুলি বাইরে বের করে দেওয়া হত; খাতা বই বিছানা বাক্স অন্য ঘরে সরিয়ে রাখা হত।

একবার উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা কবির লেখা 'বিসর্জন' অভিনয় করেছিল। এতে জয়সিংহের ভূমিকা নেন মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী (সরোজরঞ্জনের দাদা), রঘুপতির ভূমিকা নেন জগদানন্দবাবুর পুত্র ত্রিগুণানন্দ রায় (পটল দা), অপর্ণা করেছিলেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ, নক্ষত্রমাণিক্য করেছিলেন কাশীনাথ দেবল। গোবিন্দমাণিক্য যিনি করেছিলেন তাঁর মুখখানি স্পষ্ট মনে আছে, নাম ভুলে গেছি।

কবি যখন অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তখন আমি সুশীল প্রবোধ সন্তোষ প্রভৃতি জনকয়েক দুষ্টু ছেলে জানলার বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতুম ও শুনতুম। শিক্ষকদের তাড়া খেলে পালিয়ে আসতুম। মনে পড়ে— সুধীদার গেয় দু'ছত্রের গান 'আমি একলা চলেছি এই ভবে' গুরুদেব বার বার নিজে গেয়ে ওঁর ত্রুটি শুধরে দিয়েছিলেন। সুধীদা তখন খুব রোগা ছিলেন; ঢেউ-খেলানো একগাদা মাথাভরা চুল ছিল যা অদৃষ্ট-দেবতা নিতান্ত অবিচার করে প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় নির্মমহস্তে মুছে দিয়েছেন। অভিনয়ের দিন আমি আর সুশীল স্টেজের ভেতরে থেকে অভিনেতা দাদাদের ফাই-ফরমাস খাটবার অধিকার পেয়েছিলাম। হঠাৎ অভিনেতাদের পেণ্ট করতে করতে স্টিক পেণ্ট ফুরিয়ে গেল। সুধীদার তখন আধখানা অর্থাৎ মুখের একদিক পেণ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের ওপর হুকুম হল দেহলীতে ছুটে গিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে অন্তত আর একটা স্টিক পেণ্ট চেয়ে নিয়ে আসতে। সন্ধ্যা সাতটা, আকাশে মেঘ থম থম করছে, দূর থেকে মাঝে মাঝে গুড়্ গুড়্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গুরুদেব দেহলীর গাড়িবারান্দায় তখনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আর অর্ধোচ্চ স্বরে গাইছেন—'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।' আমাদের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই রে তোদের?' আমি বললুম: 'গুরুদেব, আর একটা স্টিক পেণ্ট চাই। সুধীদার মুখের এক দিক এখনো পেণ্ট হতে বাকি রয়েছে।' শুনে কৃত্রিম কোপের ঝাঁজ দিয়ে বললেন: 'সুধী কি মেম সাহেব সাজতে চায়? করছে তো ভিখিরি মেয়ের পার্ট, দামী পেণ্ট এত খরচ করলে চলে না। যা তাকে চাঁদ হয়ে অভিনয় করতে বলগে যা।' ···কথার অর্থ না বুঝে আমরা দুজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু সুর নামিয়ে বললেন: 'মুখের যে দিকটা পেণ্ট করা সেই দিকটা দর্শকদের দিকে ফিরিয়ে ওকে অভিনয় করতে বোলগে যা।' বলেই ঘরের ভেতর গিয়ে গা-আলমারি থেকে একটা স্টিক্ পেণ্ট বের করে এনে সুশীলের হাতে দিলেন। সুশীল গুরুদেবকে চেঁচিয়ে বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—'আপনি শীগ্‌গির আসুন, অভিনয় এখুনি আরম্ভ হবে।' সে রাত্রিতে পটলদার রঘুপতি সকলের অভিনয়কে ম্লান করে দিয়েছিল। 'এ জগৎ মহা হত্যাশালা······হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে'— এই নির্দয় সত্যবাণী আজো কানে বাজে।

কবির Witticism ও bon mots এক এক সময় অপাত্রে বর্ষিত হত। এই সূত্রে বহুদিন পরের একটা ছোটো ঘটনার কথা উল্লেখ করি; এটা কবির নিকট সম্পর্কীয় আমার এক বন্ধুর নিকট শোনা। বনমালী ছিল কবির বহুকালের বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধাবান ভৃত্য; কবি তাকে আদর করে নীলমণি বা লীলমণি বলে ডাকতেন। তখন কবি ছিয়াত্তর বছর বয়স উত্তরণ করেছেন, শরীর একটু একটু করে অপটু হয়ে পড়ছে, কোমর বাঁকছে, মাঝে মাঝে ছোটোখাট অসুখে ভুগছেন, তবু একদণ্ড চুপ করে বসে নেই তিনি। তখন উনি বোধ হয় উদয়নে থাকেন।

ভোর রাত্রেই প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। সকালে উঠে পুত্রবধূকে কিছু বলেন নি। কিছু ফল ও দুধ খেয়েছেন। বারান্দায় একখানি আরাম-কেদারায় একখানা কাশ্মিরী শালপোষে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে আছেন।

বেলা আটটা নাগাৎ বনমালী একটি শ্বেতপাথরের রেকাবিতে করে খান-চারেক সিঙ্গাড়া এনে একটা ছোটো তেপায়ায় রেখে তাঁর কেদারার কাছে টেনে আনল। কবি চোখ মেললেন না দেখে সে সবিনয়ে নিবেদন করল : 'কর্তাবাবুমশাই, গরম গরম সিঙ্গাড়া এনেছি ক'খান, তাড়াতাড়ি ইচ্ছে করুন দয়া করে।' মিনিট খানেক পরে আর একটা সন্ত্রস্ত তাগাদা দিতেই কবি নিমীলিত নেত্রেই বেশ গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে বললেন : 'নীলমণি, তোমার গরম সিঙ্গাড়ার চেয়ে অনেক বেশি গরম শরীর নিয়ে বসে আছি। সুধাকান্তবাবুর তাপ যদি সিঙ্গাড়ার চেয়ে কম থাকে তো তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার।'…

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় কাচমন্দিরে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উপাসনা ও উপদেশশ্রবণ হত। শান্তিনিকেতনে থাকলে কবি নিজে আচার্যের কাজ করতেন ; না থাকলে কখনো অজিতবাবু কখনো জ্ঞানবাবু কখনো কালীমোহন-বাবু কখনো বা বিধুশেখরবাবু নতুবা ক্ষিতিমোহনবাবু আচার্যের আসনে বসতেন। মন্দিরের ভেতর আলো জ্বলত না ; যারা লণ্ঠন নিয়ে আসত, তারা পলতে খাটো করে দরজার কাছে রেখে দিত। গুরুদেবের বক্তৃতার দিন বড়ো ও মাঝারি বয়সের জনকয়েক ছাত্র বা ছাত্রী দরজার ধারে স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর কাছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে তাঁর উপদেশবাণী যথাসাধ্য টুকে নিত। আমিও মাঝে মাঝে এ কাজে ব্রতী হতাম। আমাদের দলে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল প্রদ্যোৎ আর নরেন দা (নন্দী)। অতঃপর এই অসুলিখিত উপদেশগুলিকে কেন্দ্র করেই 'শান্তিনিকেতন' নামক প্রবন্ধাবলী দানা বাঁধে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মাত্র দু'বছর অবস্থানের নানা রঙের দিনগুলি পঞ্চাশবৎসরোর্ধ্বেও স্মৃতির পরতে পরতে অক্ষয় হয়ে আছে। চলতে-ফিরতে বা নিশ্চিন্ত বিরামের ছিদ্রপথ দিয়ে কতদিনের কত টুকরো টুকরো কথা, কতো হাস্যমধুর ঘটনার ছবি সংজ্ঞাত মনের পটে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ আইচ ও তাঁর আগে দু'জন সহকর্মী আশ্রমটিকে একেবারে বৈদিক যুগের আদর্শে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি সারা সকালবেলাটা তসরের কাপড় চাদর পরে খড়ম পায়ে দিয়ে ঘুরতেন। আশ্রমে চিত্রমূর্তি পূজার বিধি ছিল না বলে তিনি ফুল তুলে একান্তে কুশাসনে বসে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতেন এবং ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করতেন। গুরুদেব ও ক্ষিতিমোহনবাবুকে ক্রমাগত তাগাদায় অস্থির করে তিনি একদিন আশ্রমে একটা পুরুষ-জাতীয় হরিণ-শিশু আনিয়ে পোষার ব্যবস্থা করলেন।

জগদানন্দবাবুর দশমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলুর (সচ্চিদানন্দের) সাপ মারার যেমন বাতিক ছিল, তেমনি জীবজন্তু পোষারও দারুণ সখ ছিল। মাঝে মাঝে বেড়াল, কুকুর, বেজি, পাখি প্রভৃতি পুষত ও বিস্ময়করভাবে তাদের বাধ্য করাত। সাহসও ছিল তার অসাধারণ রকমের। যথেষ্ট সাপের ভয় আছে জেনেও সে অদূরের কেয়াবনে ঢুকে কেয়াফুল তুলে আনত। হরিণ-শিশুটি দিনের বেলা সকলের চোখের ওপর থেকে মাঠে চরত। সন্ধ্যার সময় আলু ও তাদের ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে থাকার জন্যে তাদের গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তরায়িত হত। মাস দুয়েকের মধ্যে সে

বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পড়ল এবং শিং দুটিও বেশ খানিকটা লম্বিত হল। মাঝে মাঝে সে শিং দিয়ে এ-গাছ ও-গাছের বাকল চিরে ফেলত। নগেনবাবু সকালবেলা দূরের মাঠ থেকে কচি ঘাস সংগ্রহ করে এনে তাকে স্বহস্তে সযত্নে খাওয়াতেন। হরিণটি আইচ মশাইয়ের খুব বাধ্য হয়েছিল ; অনেক সময় তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরত, এক-একদিন তাঁর ক্লাসে গিয়ে তার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। একদিন কিশোর হরিণটি তাঁর চাদরের খানিকটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। অবোধ শিশু বলে তার এই প্রগল্‌ভ অনিষ্টসাধন তিনি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেছিলেন।

একদিন সকালে জলখাবার খেয়ে আমরা ক'জন ক্লাসে যাচ্ছি, এমন সময় জগদানন্দবাবুর বাড়ির দক্ষিণ দিকটাতে নগেনবাবুর করুণ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সেইদিকে দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি নগেনবাবু মাটিতে বসে সজলচক্ষে কাতরাচ্ছেন আর কাপড়-চাদরের ধুলো ঝাড়ছেন। নগেনবাবু পুষ্পচয়ন করছিলেন, এমন সময় তাঁর আদরের হরিণ আচম্বিতে পেছনে এসে রহস্য করে কোমরের কাছাকাছি জায়গায় বেশ সজোরে ঢুঁ মেরেছে। পরক্ষণেই তিনি ভূতলশায়ী হন এবং চীৎকার করতে থাকেন। জগদানন্দবাবু হুঁকা-হাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন, আলু বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসে হরিণটাকে আচ্ছামতো লগুড়াঘাত করে। হরিণটা তখন অদূরের মাঠে পালিয়ে গিয়ে নির্বিকারচিত্তে মরা ঘাস চিবিয়ে প্রাতঃরাশ করছিল। নগেনবাবুর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না ; বড়ো ছেলেদের চারজন তাঁকে চ্যাঙ্‌-দোলা করে তুলে ঘরে পৌঁছে দিল। তিনি যাবার পথে সকরুণ কণ্ঠে উষ্মার অগ্নিস্রাব মিশিয়ে বলতে লাগলেন : 'বেইমান্, বেইমান্, পাজী, বদ্‌মায়েস! কত ঘাস খাইয়েছি, শেষটা আমাকেই—? কালিদাস এই সব্বনেশে জাতকে মহারাজ দুষ্মন্তের বাণের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!' দিন কয়েক পরে হরিণটিকে কোথায় নির্বাসনে পাঠানো হল আমরা জানতে পারলুম না।…

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমরা দুষ্ট স্বভাবকে একেবারে ভুলে যেতে পারি নি। নতুন পরিবেশে গিয়ে অনেকের সঙ্গে মিশে আমাদের দুষ্টুমি খানিকটা প্রশমিত হয়েছিল, খানিকটা রূপ-পরিবর্তন করেছিল। নির্দোষ দুষ্টুমিকে কবি কখনো অপ্রীতির চক্ষে দেখতেন না। ছেলেদের সুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্যবোধ ও সত্যনিষ্ঠাকে তোতাপাখির জীবন-যাত্রার চেয়ে বড়ো দেখতেন তিনি। দুষ্টু ছেলের দল নিয়ে তিনি ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এক একদিন বাইরে বেরিয়ে পড়তেন ; তাঁর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে গেছি আমরা অকস্মাৎ-জল-কলোচ্ছ্বাসী কোপাইয়ের ধার পর্যন্ত ; গাইতে গাইতে গেছি— 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে। খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দ রে।' …তিনি আমাদের একদল দুষ্টু ছেলেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে একবার একটা ছেলেখেলার সার্কাস শো দেখিয়েছিলেন।

ভীরু ছিলুম, রুগ্ন ছিলুম, কুনো সন্দেহবাদী হয়ে পড়েছিলুম ; এখানে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত খেলাঘরে শতজনের সান্নিধ্য ও কবিগুরুর স্নেহময় প্রভাব লাভ করে জীবনের ভোল পাল্টে গেল। ক্রমে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলুম। ব্যক্তিগত দুষ্টুমির দুটিমাত্র [redacted] দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের ওপর যবনিকা টানব।

প্রথম প্রথম নিরামিষাহারের বেদনা অসহ্য বোধ হয়েছিল— আগেই বলেছি। [redacted] আগে থেকেই সুশীল ও আর কোনো কোনো ছেলে বোধ হয় মধ্যে মধ্যে আশ্রম-নিযুক্ত মেথরদের ঘরে গিয়ে চুরি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খেয়ে আসত। নিরামিষ ভোজনের দুঃখে আমাকে ম্রিয়মাণ দেখে একদিন ও আমাকে বললে : 'মাছ-মাংস না খেলে কখনো শরীর টেঁকে? এ বড়ো অন্যায় নিয়ম। দীপুবাবু আর তার ছেলে দুজনেই রোজ মুর্গিমটিনের শ্রাদ্ধ করেন,

যদিও মুসলমান বাবুর্চিটা আশ্রম এলাকার বাইরে রান্না করে। আমাদের বেলায় যত দোষ— না? লুকিয়ে তোকে একদিন মুর্গির ডিম খাওয়াব। খাবি? এক পয়সায় একটা। কাঁচা খাবি না সেদ্ধ খাবি?'…

পরদিন বিকেলে খেলতে না গিয়ে আমরা দুজন এদিক-ওদিক চেয়ে মেথরদের কুটিরসংলগ্ন একটা ছোট্ট গোলপাতার ঝোপড়ার মধ্যে টুক করে ঢুকে পড়লুম। নর্দামা-ধোওয়ার-কাজে-ব্যবহার্য গোটা কয়েক হাঁড়ি-কলসি ও কয়েকটা খাঁটা ছাড়া সে ঘরে আর কিছু ছিল না। একটা উপুড়-করা হাঁড়ির তলায় একটি নারকোল-মালার অর্ধাংশে দুটি সিদ্ধ-করা মুর্গির ডিম এবং কাগজে-মোড়া একটু নুন ছিল। আমরা নারকোল-মালা থেকে ডিম ও নুন তুলে নিয়ে, খোলা ছাড়িয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে তার সদ্ব্যবহার করলুম। পরিশেষে হাত-মুখ নুছে নারকোল-মালার মধ্যে দু'টি পয়সা রেখে দিয়ে চুপিসাড়ে ভালোমানুষটির মতো বেরিয়ে এলুম।

সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢোকার আগে আমাদের রোল-কল হওয়ার নিয়ম ছিল। রোল-বল নিতেন প্রায়ই ক্ষিতিমোহনবাবু। সেদিন রোল-কলের পর ক্ষিতিমোহনবাবু সুশীলকে আর আমাকে ডেকে পাঠালেন। মেথরদের ঘরে গিয়ে ডিম খেয়েছি কি না সগর্জনে জিজ্ঞাসা করলেন। অমিয় নামে আমাদের বয়সী একটি ছেলে সেই বয়সেই গুপ্তচরবিদ্যায় বেশ পটু হয়ে পড়েছিল। ছেলেদের ত্রুটি বিচ্যুতি সে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করে ও তা কর্তৃপক্ষের কানে তুলে দিয়ে পুলকিত হত। সে ঝোপড়ার পিছনের দরজা দিয়ে আমাদের ডিম-ভোজনের পাপ কার্যটি স্বচক্ষে দর্শন করে সরে পড়েছিল। দোষ অস্বীকার করার উপায় ছিল না। পরদিন আমাদের সকাল-বিকালের জলযোগ বন্ধ— এই শাস্তি অবনতমস্তকে গ্রহণ করলুম বটে, কিন্তু দুবেলাই লুকিয়ে সুশীল তার জননীর কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় বিস্কুট খাইয়ে এনেছিল।…

আশ্রমে যোগ দেওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে। একদিন রোল-কলের লাইনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ বলে পার্শ্ববর্তী একটি ছেলে আমায় চুপি চুপি শিখিয়ে দিল: 'এই শোন্, মাষ্টারমশাই (ক্ষিতিবাবু) রোল-কলের শেষে যখন বলবেন ডিসমিস, তুই 'আধা পয়সার কিশ্‌মিশ্' চেঁচিয়ে বলে ছুটে পালিয়ে যাবি, বুঝলি? খুব রগড় হবে।' তর্কসংশয়ের অবসর ছিল না; সন্তোষ ভালো ফুটবল খেলত, সার্কাসী কসরৎ জানত, আমাকে বুনো কুল খাওয়াতো। কাজেই যথাসময়ে সেন-শাস্ত্রীমশাই চেঁচিয়ে ডিস্‌মিস্ বলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষপ্রদত্ত শর নিক্ষেপ করলুম এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে আম্রকুঞ্জের দিকে ছুটে পালালুম। পেছনে একটা হাসির হুল্লোড় উঠেছে এবং আমায় গ্রেপ্তার করতে একদল বড়ো ছেলে ছুটেছে— শুনতে পেলুম। দুমিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে বিচারকের সম্মুখে আনীত হলুম। ক্ষিতিবাবু 'বজ্জায় অসভ্যতা শিখেছ— না?' বলে বাঁ হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে এক বিরাশী সিক্কা ওজনের জগদ্দলী ঘুষি মারলেন পৃষ্ঠদেশে। পিঠের ব্যথা ভুলতে অনেকদিন লেগেছিল।

পূর্ব-দক্ষিণ দিকের চালাঘরটিতে সেই রাত্রেই ক্ষিতিবাবুর সীটের পাশে স্থানান্তরিত হলাম। মুকুল কিছুদিন আগেই সেই ঘরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেই আমার শাস্তির সমাপ্তি হয় নি। ক্ষিতিবাবুর খাটের নীচে ঘণ্টা-পেটা একটা কাঠের হাতুড়ি থাকত। ভোর রাত্রে তিনি সজোরে নাড়া দিয়ে আমাকে তুলে দিতেন। এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে হাতুড়ি নিয়ে ঘুমজড়িত চক্ষে ঘুরঘুট্টি নিশুতি অন্ধকারের বুক চিরে আমাকে প্রত্যহ আম-বাগানের প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের সামনে আসতে হত। সেখানে একটি আমগাছের নিচু ডালে পেটাঘড়ি টানানো থাকত; আমাকে দুমিনিট ধরে দ্রুত লয়ে জাগরণী ঘণ্টা বাজাতে হত।… সেই থেকে আজীবন পরের জন্যে অনেক ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছি, নিজের ঘণ্টা বোধ হয় এ যাত্রা স্তব্ধ হয়েই রইল!

জ্ঞাপন

প্রকাশ থাকে যে, গত ১৯৬১ সালের শেষভাগে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষালয়-কর্তৃক প্রকাশিত (গীতবিতান, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায়), এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণাগারে (Museum) সযত্নে রক্ষিত হয়েছে, কারণ ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ ও সহকারিগণ তৎকালের মধ্যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সংক্রান্ত যে শতাধিক প্রবন্ধ বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে পাঠ করবার অবসর ও সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে আমার এই প্রবন্ধটিই শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচনা করেছেন। আমার প্রবন্ধ-সংবলিত গীতবিতান পত্রিকার ঐ মূল্যবান প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ সংখ্যাটি মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ প্রায় জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বিতান'-কর্তৃপক্ষ এই খোলা পৃষ্ঠা ক'টি দিয়ে আমার মুখ-রক্ষা করেছেন।